ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রতিবন্ধী শিশু

আমাদের চারপাশে এমন কিছু শিশু দেখা যায় যারা স্বাভাবিক শিশুদের মতো নয়। তাদের দেহের গঠন আলাদা, তাদের আচরণ স্বাভাবিকের তুলনায় ধীর বা সমস্যাগ্রস্ত। এদের মধ্যে কেউ চোখে ভালো দেখতে পায় না, কারও হাঁটাচলায় অসুবিধা, কারও অন্যের কথা বুঝতে দেরি হয়, কেউ বা বয়সে বড় হলেও শিশুদের মতো আচরণ করে। এসব শিশু কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার। এরাই প্রতিবন্ধী শিশু। এদেরকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুও বলা হয়। কারণ এদের পূর্ণ বিকাশে বিশেষ যত্ন ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এসব প্রতিবন্ধীদের জীবন যাপনে সহায়তার জন্য এদের সম্বন্ধে আমাদের সবার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। এজন্য প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়।

কেউ জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে, কেউ জন্মের পর যেকোনো দুর্ঘটনা, অপুষ্টি বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ প্রতিবন্ধী। এই হিসাবে আমাদের দেশে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। দরিদ্র দেশ হিসেবে আমাদের দেশে এই সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাঠ ১ – প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিভাগ

প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন – শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

শারীরিক প্রতিবন্ধী

যাদের হাত কিংবা পা অসম্পূর্ণ, অবশ, দুর্বল থাকে, দেহের গঠন স্বাভাবিক নয় বা দেহের কোনো অংশ ব্যবহারে অক্ষমতা থাকে, যার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অসুবিধা হয়, তারাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। যেমন – পায়ের গঠনে ত্রুটি থাকলে চলাচলে এবং হাতের গঠনে ত্রুটি থাকলে কাজ করতে অসুবিধা হয়। বুদ্ধিগত কোনো সমস্যা না থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারে। তাদেরকে শারীরিক সমস্যার জন্য বিভিন্ন সহায়ক উপকরণের সহায়তায় চলাফেরা করতে হয়। যেমন– ক্রাচ, ওয়াকার, হুইল চেয়ার ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে চলাচলের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গায় র‍্যাম্প (সিঁড়ির স্থানগুলোতে ঢালু রাস্তা)- এর ব্যবস্থা করলে তাদের চলাচলে বিশেষ সুবিধা হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধী

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

চোখে দেখতে পারে না বা চোখে দেখায় এমন ধরনের সমস্যা থাকে যার কারণে জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে অসুবিধা হয় এবংযারা চোখে আংশিক বা পুরোপুরি দেখতে পায় না তারাই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দেখতে সমস্যা হয় বলে চলাফেরা ও কাজকর্ম ধীরে হয়, এসব অসুবিধা তাদেরকে পরনির্ভর করে রাখে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার মাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন–অল্প মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এবং আংশিক মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা। অল্প মাত্রার প্রতিবন্ধীরা অন্ধকার ছাড়া কোনো কিছুই দেখে না বা উজ্জ্বল আলো আসার গতিপথ বলতে পারে। এরা অঙ্ক, সংখ্যার ধারণা, শব্দ ভান্ডার এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শিশুর মতোই হয়। তারা স্পর্শ দিয়ে বস্তু চেনে, বস্তুর নাম শেখে। জন্মগত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্য বুঝতে পারে না, যেসব দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু পরবর্তী সময়ে অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে দৃষ্টি হারায় তাদের মনের কষ্ট অনেক বেশি। আংশিক মাত্রার প্রতিবন্ধীরা দূরের জিনিস দেখতে পারে না। কাছের জিনিস অস্পষ্ট দেখলেও কাজ করতে তাদের অসুবিধা হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির নাম ব্রেইল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে স্পর্শের মাধ্যমে উঁচু ফোঁটা দিয়ে বর্ণ ও সংখ্যা তৈরি করে লেখাপড়া করানো হয়।

	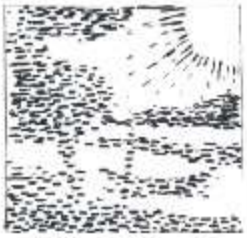	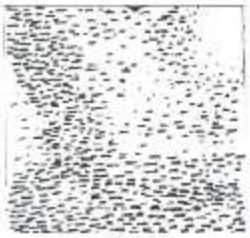	
স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু যেভাবে দেখতে পায়	আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু যেভাবে দেখতে পায়	শুধু একটি উজ্জ্বল আলো আসার গতিপথ বলতে পারে	পরোপুরি দৃষ্টিহীন শিশু যা দেখে

শ্রবণ প্রতিবন্ধী– যাদের শোনার ক্ষমতায় ঘাটতি, যার কারণে কথা শুনতে বা কথা বলার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এদের ক্ষেত্রে বধির বা কালা এবং কানে খাটো ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। একটি স্বাভাবিক শিশু শব্দ ও কথা শোনে, তারপর তারা কথা বলতে শেখে। যেহেতু শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা শব্দ বা কথা শুনতে পারে না, তাই তারা কথা বলতে শেখে না। জন্ম থেকেই বা কথা শেখার আগেই এ সমস্যা দেখা দিলে ভাষার বিকাশ হয় না। এই সমস্যা অল্প বা গুরুতর হতে পারে। অল্প মাত্রার সমস্যা হলে তারা জোরে কথা বললে কিছুটা শুনতে পারে। গুরুতর শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা থাকলে কোনো শব্দই শুনতে পায় না। তারা কথা বলার পরিবর্তে অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বা ইশারায় নিজের চাহিদা প্রকাশ করে। এদের কথা কেউ বুঝাতে পারে না বলে সব সময়ই এরা হতাশাগ্রস্ত থাকে।

পাঠ ২– বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

যাদের বুদ্ধি বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম থাকে, যার ফলে শিশু তার সমবয়সিদের মতো আচরণ করতে পারে না। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সমস্যা ধরা পড়ে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতারও বিভিন্ন মাত্রা থাকে। যেমন– মৃদু, মধ্যম, গুরুতর।

মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা – এদের বুদ্ধি ৮ থেকে ১১ বছরের শিশুর মতো হয়। তাই প্রাপ্তবয়সে ১১ বছরের স্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা যেসব লেখাপড়া বা কাজ করার বুদ্ধি রাখে, ততটুকু পর্যন্ত মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুটি লেখাপড়া বা আচরণ করতে পারে। এদেরকে বিশেষ শিক্ষা দিয়ে আত্মনির্ভর করা সম্ভব।

মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা– এদের বুদ্ধি ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর মতো হয়। তাই ১৮ বা তদূর্ধ্ব বয়সে মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর মতো আচরণ করে। এদের বাচন ত্রুটি ও নানারকম শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। যেমন– ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ, শিশুসুলভ ভাষা ইত্যাদি। এদের প্রশিক্ষণ দিলে কিছু শিখতে পারে। এই প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে এদের পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা। এদেরকে কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ শেখানো যায়। যেমন–প্যাকেট করা, সিল মারা, বেকারির কাজ ইত্যাদি।

গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা– এদের বুদ্ধির মাত্রা এত কম থাকে যে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মতো হয়। তারা খাওয়া, পরিচ্ছন্নতা, টয়লেট কাজ সম্পন্ন করতে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। এদের অনেক ধরনের আচরণের সমস্যা দেখা যায়। অন্যের তত্ত্বাবধানে এদের জীবন ধারণ করতে হয়। বিশেষ যত্ন ও প্রশিক্ষণে তাদের দৈনন্দিন কাজের অভ্যাস তৈরি করা যায়।

বাক্ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু

আমাদের সমাজে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের অনেক সময় পাগল বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা কোনো মানসিক রোগ নয়। এটি এক ধরনের মানসিক অবস্থা বা অক্ষমতা। এই অক্ষমতা চিকিৎসা দিয়ে সারানো যায় না। তবে যে যতটুকু মাত্রায় প্রতিবন্ধী, সে বিশেষ যত্ন পেলে তার ক্ষমতা অনুযায়ী আচরণ করতে পারে। আবার বিশেষ যত্নের অভাবে তার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হয় না। তার আচরণের অবনতি ঘটে।

এছাড়া একই সাথে একাধিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে তারা বহুবিধ প্রতিবন্ধী। যেমন–শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ ও বাক্, বুদ্ধি ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধিতার মাত্রা গুরুতর হলে তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। এ ধরনের প্রতিবন্ধীরা খাবার ও টয়লেটের কাজের জন্য প্রায় অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে বা বিশেষ সরঞ্জাম ছাড়া তারা চলাফেরা করতে পারে না। মৃদু ও মাঝারি মাত্রার প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা কিছুটা কঠিন হয়। একটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্পর্কে জানা থাকলে অতি সহজেই শিশুটি প্রতিবন্ধী কি না তা বোঝা যায়। স্বাভাবিক শিশুর মতো প্রতিবন্ধীদেরও মৌলিক চাহিদা রয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা, উপযুক্ত খাবার, বিশেষ যত্ন ও প্রারম্ভিক উদ্দীপনার।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে, প্রারম্ভিক উদ্দীপনার অর্থ কী? উদ্দীপনা বলতে বোঝায় একটি শিশুকে তার চারপাশের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে জানা ও দেখার সুযোগ করে দেওয়া আর সেগুলো নিয়ে খেলা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। যেমন–শিশুকে সময় দেওয়া, শিশুর সাথে কথা বলা, গান করা, খেলাধুলা করা, কাজ করা, তাকে ভালোবাসা ইত্যাদি। অতি শৈশব থেকে এই উদ্দীপনার সুযোগ সৃষ্টি করাই হলো প্রারম্ভিক উদ্দীপনা।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য দরকার হয় বিশেষ সহায়ক সরঞ্জাম

প্রতিটি শিশুর দেহ ও মন সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য প্রারম্ভিক উদ্দীপনা দরকার। স্বাভাবিক শিশুরা সহজেই মেলামেশার মাধ্যমে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে এই উদ্দীপনা পায়। কিন্তু প্রতিবন্ধ শিশুদের পক্ষে তার চারপাশের জগৎকে জানা ও বোঝা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এদের জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্ন, বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। আমাদের প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক শিশুর উপযোগী করে তৈরি করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পরবর্তী সময়ে এই শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয় না। তার জন্য দরকার প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা। শিশু যত ছোট অবস্থায় এই উদ্দীপনা বা বিশেষ শিক্ষা পায়, তত তাড়াতাড়ি তার আচরণের উন্নয়ন ঘটে এবং সক্ষমতা বাড়ে।

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা → **বাড়তি যত্ন প্রারম্ভিক উদ্দীপনা** → **বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ** → **বর্তমান অবস্থার উন্নতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি**

কাজ ১– তোমার পরিচিত কোনো প্রতিবন্ধী শিশুর ধরন সম্পর্কে লেখো।
কাজ ২– কী ধরনের প্রারম্ভিক উদ্দীপনা দেওয়া হয় তা লেখো এবং ক্লাসে পড়ে শোনাও।

পাঠ ৩– প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবারের দায়িত্ব

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে জানার আগে প্রতিবন্ধী শিশুটির কারণে পরিবারটি কী ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ে, আমরা তা জেনে নিই–

সমস্যা ১

পরিবারটি যখন সন্তানের অস্বাভাবিকতা বুঝতে পারেন, তখন তারা চিকিৎসকের কাছে যায়। চিকিৎসকের কাছে সন্তানের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে শোনার পর মা-বাবা বিষয়টি মেনে নিতে পারেন না। তখন তারা বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে ছোটাছুটি করেন। এতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ফলে প্রারম্ভিক উদ্দীপনা ও বিশেষ যত্ন পেতে শিশুটির বিলম্ব হয়। সব পিতামাতার মনে প্রশ্ন জাগে, আমার সন্তানটি কবে ভালো হবে? সে কি কোনো দিন কথা বলতে পারবে? কবে থেকে সে বয়স অনুযায়ী আচরণ করবে? তারা মনে করেন, অন্যান্য রোগের মতো প্রতিবন্ধিতাও চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো সম্ভব। তাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে অনেক কষ্ট হয় যে, তাদের সন্তানের এই প্রতিবন্ধিতা সারা জীবনের জন্য বহন করতে হবে।

সমস্যা ২

প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম হওয়ায় বিভিন্ন কারণে মায়ের মন ভেঙে যায়। যেমন– অনেক ক্ষেত্রে মাকে এরকম সন্তান জন্ম দেওয়ায় দোষারোপ করা হয়। সন্তানের দেখাশোনার জন্য মায়ের ওপর প্রচণ্ড কাজের চাপ পড়ে। তখন সন্তানটির প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়ার জন্য তিনি উৎসাহ পান না।

সমস্যা ৩

প্রতিবন্ধী শিশুটির চিকিৎসা, বিশেষ যত্ন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত শ্রম, সময়, ধৈর্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। এগুলোর ব্যবস্থা করতে পরিবারটিকে সমস্যায় পড়তে হয়।

সমস্যা ৪

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে নানা রকম অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়। অতিরিক্ত চঞ্চলতা, জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা, একই কাজ বারবার করা ইত্যাদি আচরণের কারণে সব সময় তাকে দেখে রাখার দরকার হয়। ফলে প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে গেলে আত্মীয়স্বজনেরা অনেক সময় বিরক্ত হন।

প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সমস্যার কথা তোমরা জানলে। তোমরা আগের পাঠে জেনেছ যে, শিশুর উপযুক্ত বিকাশের জন্য দরকার উন্নত পারিবারিক পরিবেশ। প্রতিবন্ধী শিশুটির ক্ষেত্রেও উন্নত পারিবারিক পরিবেশ ও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। এজন্য যা যা করণীয়–

- প্রতিবন্ধী শিশুটিকে অন্য স্বাভাবিক শিশুর মতোই ভালোবাসা দিতে হবে। পরিবারের মধ্যে মা-বাবা, ভাই-বোনের কাছে যদি সে ভালোবাসা পায়, তবে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনেরাও তাকে সেভাবে ভালোবাসবে।
- শিশুর প্রতিবন্ধিতা বোঝার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকে তাকে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম শিখতে সাহায্য করা এবং তার ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- শিশুর জন্য বিশেষ যত্ন, চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন– স্বল্প মাত্রার শ্রবণ প্রতিবন্ধীর জন্য শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য চশমা, ছড়ি, শারীরিক প্রতিবন্ধীর জন্য ক্রাচ, হুইল চেয়ার, লাঠি, বিশেষ নক্শার চেয়ার, জুতা ইত্যাদি।
- যেকোনো অনুষ্ঠানে পরিবারে সবার সাথে তাকে বেড়াতে নিতে হবে। যেমন– পিকনিক, বিয়ে, শিশু পার্ক, মেলা ইত্যাদি। সেখানে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাদের সাথে কথা বলতে বলা, যা কিছু নতুন সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুটি সহজেই সবার সাথে খাপ খাওয়াতে শিখবে। অনেক সময় বাড়িতে অতিথি এলেও শিশুটিকে সামনে আনা হয় না, একা ঘরে রাখা হয়। এতে তার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
- প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় অপুষ্টির শিকার বেশি হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে অপুষ্টির কারণেও প্রতিবন্ধী হতে দেখা যায়। যেমন–"ভিটামিন এ"-এর অভাবজনিত কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয়। এজন্য স্বাভাবিক শিশুর পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুটির বয়স অনুযায়ী সুষম খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিবারে বাবামায়ের সাথে ভাই-বোন বা অন্যান্য সদস্যদেরও প্রতিবন্ধী শিশুটির বিশেষ যত্নে অংশগ্রহণ করতে হবে। এতে বাবা-মায়ের বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে এবং তারা প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা ও বিশেষ যত্ন

কাজ ১– একজন প্রতিবন্ধীর জন্য পরিবারের দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে লেখো।

পাঠ ৪– প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি সমাজের দায়িত্ব

সমাজ কাদের নিয়ে? সমাজ আমাদের নিয়ে, আমাদের চারপাশের সকলকে নিয়ে। প্রতিবন্ধী শিশুরা সমাজে বড়ই অবহেলিত। তাদের অবহেলার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

- প্রতিবন্ধী শিশুরা কম বুঝতে পারে বলে অনেকেই এদেরকে বোকা, পাগল বলে, হাসি-ঠাট্টা করে।
- সমবয়সিরা প্রকাশ্যে তাদের উত্ত্যক্ত করে। খেলায় নেয় না, তার সাথে মেশে না।
- আত্মীয়স্বজন প্রায়ই বেড়ানোর প্রোগ্রামে এদেরকে তালিকা থেকে বাদ দেন।
- এরা অসুস্থতার কথা ঠিকভাবে বোঝাতে পারে না। এজন্য এদের চিকিৎসায় প্রচুর সময়ের দরকার হয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসায় অবহেলা দেখা যায়।
- বিশেষ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষক, কর্মচারী আন্তরিক না হলে এদের অযত্ন হয়। যেমন–এদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলা, এদের প্রতি মনোযোগের অভাব ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধী শিশুদের সহায়তার জন্য কীভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করা দরকার?

প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী আমাদের অবশ্যই তাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন– দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীর জন্য ইশারায় ভাষা শিক্ষা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিজের কাজ নিজে করতে পারার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া, তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপার্জন করার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই থাকে শিশুটি যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। এই কার্যক্রম তখনই সফল হবে, যখন শিক্ষকেরা তাদের প্রতি যত্নবান হবেন। তাদের সৌহার্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর, ধৈর্য, আন্তরিকতা একজন প্রতিবন্ধী শিশুকে প্রশিক্ষণে উৎসাহী করবে, স্কুলে আসতে আগ্রহী করে তুলবে।

তোমরা যদি প্রতিবন্ধী শিশুটির আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহপাঠী কিংবা সমবয়সি হও, তবে তোমরাও তার উদ্দীপনা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারো। তোমরা যা যা করতে পারো–

- যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে সঙ্গ দেওয়া, দেখাশোনার দায়িত্ব তুমি নিজে নিতে পারো।
- প্রতিবন্ধীদের ধরন অনুযায়ী খেলাধুলার আয়োজন করতে পারো। যেমন– দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের গল্প শোনানো, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সাথে দাবা খেলা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সাথে গান, গল্প, ছবি আঁকা ইত্যাদি।
- এলাকায় কোনো প্রতিবন্ধী দরিদ্র হলে তার জন্য আর্থিক সহায়তার উদ্যোগ নিতে পারো।
- ছোট শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুকে ভয় পায়। তার এই ভয় দূর করার জন্য তুমি ভূমিকা রাখতে পারো। প্রতিবন্ধী শিশুটির অসুবিধাগুলো ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিলে ঐ স্বাভাবিক শিশুটিও প্রতিবন্ধী শিশুটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারে।
- প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে নানাভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারো।

সমাজ ও পরিবারের সবার সহযোগিতায় একজন প্রতিবন্ধী কীভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, তার একটি ঘটনা তোমাদের জানাই, জন্মগতভাবে চোখে দেখে না ছোট্ট মেয়ে কাজল। তার মা বাবা যখন জানতে পারলেন তাঁদের সন্তান দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তখন তাঁরা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছর আগে আস্তে আস্তে দৃষ্টি হারিয়ে যাওয়া দাদি বললেন আমিও একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। আমি এখনো শব্দ ও স্পর্শ দিয়ে সব কিছু বুঝতে পারি। ওকেও এভাবে শেখাতে হবে। তাঁরা নিকটস্থ পরামর্শ কেন্দ্রের সাহায্যে শিশুটিকে শোনার, অনুভব করার, কোনো কিছুর গন্ধ নেওয়ার প্রচুর উদ্দীপনা দিতে শুরু করলেন। দাদি তাঁর সাথে প্রচুর কথা বলতেন, গান শোনাতেন। তাকে স্পর্শ করে চলাফেরা শেখানো হলো। খেলার মাঠে নেওয়া হলো। তিন-চার বছর থেকে সে নিজেই বাথরুমে যেতে পারত। ছয় বছর বয়সে সে বিশেষ স্কুলে যেতে শুরু করল। প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা তাকে সাথে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য আসত। পাড়ার লোকজন যখন তাদেরকে দেখত তারা বুঝতেই পারত না কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী শিশুটির পরিবারের প্রতি যতভাবে সম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়ানো প্রয়োজন। আমাদের সব কাজের মাধ্যমে বোঝাতে হবে যে প্রতিবন্ধী শিশুটির পাশে আমরাও আছি। সমাজের সবার অফুরন্ত ভালোবাসা তাদের এগিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তাদের জগৎটাকে সহজ ও সুন্দর করে তুলবে। প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ যত্ন, মনোযোগ ও ভালোবাসায় সে আরও বেশি সক্ষম ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে।

প্রতিবেশীরা বুঝতেই পারে না কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

কাজ ১– প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে তার পরিবার যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে তার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও শিক্ষক কীভাবে সহযোগিতা করতে পারেন তা লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কোন তারিখে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়?

ক. ২রা ডিসেম্বর খ. ৩রা ডিসেম্বর
গ. ৪ঠা ডিসেম্বর ঘ. ৫ই ডিসেম্বর

২. সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ শিশুকে সহায়তা করতে পারে–

i. উপযুক্ত বিকাশে
ii. অক্ষমতা হ্রাস করতে
iii. আত্মনির্ভরশীল হতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চয়ন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। শিক্ষকের মুখে বলা কথা শুনে সে ঠিকমতো খাতায় লিখতে পারে। কিন্তু বোর্ডের লেখাগুলো ঠিকমতো খাতায় তুলতে পারে না। ফলে শ্রেণির কাজ সময়মতো করতে পারে না। এজন্য শিক্ষক তার উপর অসন্তুষ্ট হতো। এতে ধীরে ধীরে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। শ্রেণি শিক্ষক বিষয়টি লক্ষ করে চয়নের বাবামাকে জানালে তাঁরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

৩. চয়ন হলো

ক. শ্রবণ প্রতিবন্ধী খ. বাক্ প্রতিবন্ধী
গ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ঘ. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

৪. **কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চয়নকে এ অবস্থার শিকার হতে হতো না?**

i. পরিবারের সহযোগিতা
ii. শিক্ষকের সহযোগিতা
iii. সময়মতো চিকিৎসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. প্রান্তি ও প্রত্যয় দুই ভাইবোন। প্রত্যয়ের বয়স দুই বছর কিন্তু প্রান্তি এখন কিশোরী। প্রান্তি প্রায়ই প্রত্যয়ের মতো আচরণ করে এবং অকারণে হাসতে থাকে। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে গান শুনিয়ে, ছবি আঁকতে দিয়ে এবং গল্প শুনিয়ে ব্যস্ত রাখে। সবাই প্রান্তির কথা মন দিয়ে শোনে, তার মা ধৈর্যের সাথে তার যত্ন নেন।

ক. **সমাজ কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে?**
খ. প্রারম্ভিক উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় কেন?
গ. প্রান্তির আচরণে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. প্রান্তির পরিবারের সবার আচরণ তাঁর সুস্থতার সহায়ক– বিশ্লেষণ করো।